প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটো গল্প

নিতাই বসু

কোনও লেখককে জানার বা তাঁর পক্ষে ধরা পড়তে গেলে তাঁর নিজস্ব নির্বাচনের চেয়ে ভালো আয়না আর নেই। সমালোচকের অতি সূক্ষ্ম শলাকাও সর্বদা যার নাগাল পায় না, লেখক মাত্রেই তেমন একটি লুকোনো আয়না - মন থাকে।

প্রেমেন্দ্র নিজেই বলেছেন, ডাইনে - বাঁয়ে বহু বন্ধু তাঁর আছেন যাঁদের নিপুণ নির্বাচনে তাঁর অনেক গল্প হয়তো স্বীকৃতি পাবেনা, তাঁরই অখ্যাতির আশঙ্কায় তাঁর কিছু গল্প তাঁরা নিশ্চয় বাতিল করে দেবেন।

কিন্তু তাঁরা ছাড়পত্র না দিলেও নিজের লেখা অনেক গল্পের উপর তাঁর অনেক দুর্বলতা ছিল যেগুলো বাজারের বাহবা নিয়ে আসেনি। তাদের প্রতি লেখকের দুর্বলতাই তাদের ছাড়পত্র বলা যায় কিন্তু দুর্বলতাই যদি হয়, তা বাদ দিলে লেখকের পরিচয় যে আবার সম্পূর্ণ হয় না। লেখকের পছন্দ - অপছন্দের মধ্যে সাধ ও সাধ্যের একটা সীমারেখা মিশে থাকে এবং পাঠকের নিভৃত মনের দরজায়সবিনয়ে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যেই লেখকের নিজের পছন্দ - করা গল্পগুলোর মধ্যে শিল্পীমনের কুণ্ঠিত অথচ সানন্দ স্বনির্বাচনের চেহারা দেখে লেখককে চিনে নেওয়া যায়। এই আলোকে আমরা প্রথমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পকে বিচার করব।

'বৃষ্টি' গল্পের প্রতুল এবং লতিকার জীবনের দ্বন্দ্ব সংশয় ও বিড়ম্বনার প্রেক্ষিতে বাইরের জগতে দিনের পর দিন একঘেয়ে একটানাভাবে 'মৃতমুখের মতো পাংশুবর্ণ আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়া'র উপস্থাপনা লেখকের কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তণ চিকিৎসক প্রতুল ওই হাসপাতালেরই লতিকার সঙ্গে প্রেমে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তখন লতিকার বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায় অথচ লতিকা ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তায় ওকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রতুলের 'অসামান্য আত্মত্যাগে' সে নিজেকে সারাজীবন অপরাধী করে রাখতে চায় না। প্রতুলের আত্মপ্রসাদ - মগ্ন দৃষ্টির বিষে সে তার জীবন জর্জরিত করতে দেবে না। সে প্রতুলের ত্যাগ প্রত্যাখ্যান করে। সেই মুহূর্তে 'বাইরে থেকে বৃষ্টির চাপা শব্দ আসছে, হিংস্র কোনো শ্বাপদের সতর্ক সঞ্চরণের মতো।' প্রখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্রর কবিসত্তা, জীবন সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পকার হিসেবে সমাপ্তি বাচনে একটি জিজ্ঞাসা গল্পটিকে একটি অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়।

জীবনের নানা ধরনের অচেনা পটভূমি থেকে প্রেমেন্দ্র তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। বন্ধ্যা ক্ষ মাটির দেশে জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে জনৈক নিম্নপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার যুবকের কাছে প্রৌঢ় চিকিৎসক বিনয়বাবুর জীবনের একটি কণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'অমোঘ' গল্পে। মুখর না হয়ে মৌন হলেও বিনয়বাবুর সঙ্গে নলিনীর প্রেম ছিল অতল গভীর। চিকিৎসক হয়ে সুদূর পশ্চিমে বিনয়বাবু চলে গেলেন এবং মাত্র দু-বছর বাদে ফিরে এসে দেখলেন জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হয়ে নলিনীর বাবা তার বিয়ে দিয়েছেন। এক বৎসরের মধ্যে নলিনী বিধবা হয়ে ফিরে এলেও তার বাবার সাগ্রহ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সে আর বিয়ে করল না। পরন্তু সে জপ - তপ, বার - ব্রত, ছোঁয়াছুয়িঁর বিচার - আচার এবং গঙ্গাজলের শুদ্ধি নিয়ে সারাটা জীবন পড়ে রইল। 'অপরূপ, রহস্যময় এই মানব- আত্মা শূন্য আকাশ যে দেবতার ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার স্পর্ধা যে করে, শেষ পর্যন্ত সেও একটা শুকনো, কুৎসিত ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের অমোঘ বিধান তার আদর্শ, সমস্ত স্বপ্নকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেঁৎলে নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে যায়।'

এই ধরনের বিচিত্র পটভূমিতে লেখা 'নিদ্দেশ' গল্পটিও লেখক ও তাঁর বন্ধু সোমেশ নিদ্দেশ - সম্পর্কিত কিছু গল্পগুজব করার ফাঁকে সোমেশ একটি বিচিত্র ঘটনার কথা বলে। শোভন নামে একটি ছেলে একবার ভয়ঙ্কর অভিমানে বাড়ি ছেড়ে নিদ্দিষ্ট হয়। কিন্তু মাত্র দু-বছর পরে যখন সে বাবা - মায়ের কাছে ফিরে আসে তখন বাবা যেন শোকে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তার মুমূর্ষু মা -ও তাকে চিনতে পারল না। জমিদারের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সন্তানহারা মাকে সে যেন শোভনের ভূমিকায় দেখা দেবার জন্য বাবার অনুমতি পেল। এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক পরিণতিতে গল্পটি শেষ হয়েছে।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রেমেন্দ্রর একটি বহু আলোচিত গল্প। বিগতযৌবনা বারাঙ্গনা বেগুন বেশভূষা দূরের কথা, কিছুদিন ধরে দু-বেলার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থানও করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত দিনযাপনের তাড়নায় অশেষ বিড়ম্বনার শিকার হতে হল। একমাত্র বঁাচার তাগিদে অসীম অসহায় হতাশায় বেগুন শেষ পর্যন্ত এমন এক বীভৎসদর্শন ব্যক্তির কাছে নিজেকে বেচতে গেল যে নিতান্তই কপর্দকহীন, মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন। এই গল্পটি প্রেমেন্দ্র ঢাকায় বসে লিখেছিলেন। গল্পের নামটি দিয়েছিলেন তাঁরই লেখা 'দেবতার জন্ম' থেকে, যে - কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন স্কুলের কবিতার খাতায়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, যখন বাংলা কথাসাহিত্য অভিযুক্ত হয়েছিল যৌনতার অপরাধে, সে সময়ে একমাত্র প্রেমেন্দ্রই ছিলেন সে-অভিযোগ থেকে মুক্ত। আমরা স্মরণ না করেপারি না তিনি রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় প্রশংসা পেয়েছিলেন। এমনকি, মোহিতলালও তাঁর প্রতি নির্মম হতে পারেননি। এক বাঁ - হাতি অভিবাদন তাঁকেও জানাতে হয়েছিল। কিন্তু বলার কথা এই যে অযৌনতা তাঁর কোনও চিব াদের ফল নয়। আমাদের অবশ্যই মনে আছে দেহজীবিনীদের নিয়ে লেখা তাঁর মোক্ষম গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'র প্রথম নামকরণে ভগবানের উল্লেখ ছিল। পরিমার্জনে ভগবান বিসর্জন তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা 'ভগবান' থাকলে ইপ্সিত বিবমিষা ভোঁতা হয়ে যেত। গল্পটির প্রধান কথা জিজীবিষা। অন্ধকার নগর পথে বেগুন তার গত্যন্তরবিহীন সঙ্গীটিকে নিয়ে চলতে থাকে। সে যাত্রায় আনন্দ নেই, আশ্বাস নেই। কিন্তু পরাজয়ও তো নেই। লেখক এখানে এবং সর্বত্রই জীবনের গম্ভীর বিষন্ন মূর্তি গড়ে তোলেন। তা যে কখনও মর্বিড হয়ে ওঠেনা তার একটা কারণ - অস্তিত্বকে সময়ের হাতে, নিয়তির হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখেও, সে লাঞ্ছনাই ভবিতব্য -- একথা জেনেও সে ভূমিশায়ী হয় না। যৌনতা তো আকাঙ্ক্ষার এবং আত্মপ্রকাশের একটা রূপ। একটা বিষয় এখানে আমাদের দৃষ্টি টানে, তাঁর লেখায় ব্যক্তির যৌন - চেতনা কখনও প্রশ্রয় পেল না। তার কারণ তিনি মানুষের সমগ্র অর্থ খুঁজতে চেয়েছিলেন। মানুষের সমগ্র অর্থেরকাছে তার জীবিকা, শ্রেণিসংস্থা, যৌনতা এগুলি শেষ পর্যন্ত গৌণ-এ ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনার্থ বোধ। সেজন্যই বোধ হয় তাঁর গল্পের জীবনের আনন্দের দিকের কোনও উদ্ভাসন নেই। প্রেমের প্রগাঢ়তা নিয়ে তিনি কখনও মুখর হননি।

'সিদ্ধকল্প' গল্পটিতে কোনও গল্পত্ব নেই। গল্পটিতে না আছে কোনও বিস্ময়ের চমক, না আছে একমুখিনতা। বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক ধরণীধর গাঙ্গুলী যখন তাঁর এক কর্মচারির মেয়ের রান্নার প্রতি তাঁর ছেলে দুর্বলতা বোধ করলে বিচলিত হন তখন মনে হয় তাঁর জীবনে একটা সংঘাত আসন্ন কিন্তু তাঁর ছেলে ওই মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলে ধরনীধর খোলা দরজার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। 'নিশাচর' রীতিমতো বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না, অঙ্কে মেলাতে পারি না - এক কথায় এক গল্প এক - একটি রহস্য - কাহিনী, জীবনের অনাদ্যন্ত রহস্যের নিপুণ উন্মোচন। এ-কারণেই তাঁর গল্পে ঘটনা নাটকীয়তা নেই। যা আছে তা হল নিস্তরঙ্গ স্বাভাবিকতার আবরণ।

প্রেমেন্দ্রের অধিকাংশ গল্পই একবার পড়ে অন্যকে বলতে গেলে দেখা যাবে তার মধ্যে বলার মতো ঘটনার পরম্পরা এবং গল্পের শেষে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা নেই। তাঁর অনেক গল্পই আসলে এক - একটি নিটোল কবিতা, যা ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। তাঁর গল্পে ঘটনার বিবরণ নগণ্য। ঘটনাগুলো এক - একটি চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্পগুলো নির্বাচন করে তিনি এমন কৌশলে বিন্যাস করেন যাতে সমগ্র যোগফলটা মনের কোথাও গভীরতর আলোড়নকে ক্ষণিকের জন্য অমোঘ সত্য করে তোলে।

'এক অমানুষিক আত্মত্যাগ' মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে রচিত একটি মজার গল্প। গুয়াহাটি শহরে একটি বাঘের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে কঠে ারপ্রাণ আদ্যনাথের সঙ্গে তার স্ত্রী নীলিমার মিলন এই গল্পের বিষয়বস্তু। নীলিমার প্রেমনিষ্ঠা ও শ্যালিকা মলিনার সোৎসাহসহযোগিতা আদ্যনাথকে কিছুতেই নীলিমার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারেনি কিন্তু বাঘের আকস্মিক আর্বিভাবে প্রাণভয়ে ভীত আদ্যনাথ যখন নীলিমার ক াছে আদ্যন্ত আত্মসমর্পণ করল তখন সেটা বাঘ না ব্যাঘ্রপ্রতিম আদ্যনাথ -- কার অমানুষিক আত্মত্যাগের ফলে সম্ভব হল,সেটাই বিচ র্য।

'অরণ্যপথ' মনস্তাত্ত্বিক গল্প। স্টিমার ভ্রমণের সময় লেখকের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তিনি তাঁর বন্ধু বিমলের সঙ্গে স্টিমারে চড়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত কষ্টকর বৈচিত্র্যহীন ভ্রমণের একঘেয়েমির মধ্যে নারীর কলহাস্য তাঁদের কৌতূহলী করে তে ালে। মালবাবুটির নাম রামবাবু এবং ভদ্রলোক এদের নিমন্ত্রণ করলে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে। তখন জানা যায়, বিকলাঙ্গ কন্যার মর্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রামবাবুর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। রামবাবু মনে করেন বিকারগ্রস্ত পঞ্চদশী প্রতিবন্ধিনী তাঁরই 'অপর াধের প্রত্যক্ষ শাস্তি'। 'জনহীনাপদ - সঙ্কুল গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া তখন স্টিমার চলিতেছে। সে অরণ্য ভয়ঙ্কর - কিন্তু মনে হইল ম ানুষের মনে অরণ্য রহস্য - বিভীষিকায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি তার কারণ তিনি নিজেই। পাঠকের কাছে তাঁর দাবি বড্ড বেশি --- প্রবল কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, প্রচুর অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা, পৃথিবী ও মহাব্বি সম্বন্ধে অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা, জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের জন্যে গভীর আগ্রহ। সত্যিই তো, স্পর্শসচেতন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের কাছে জীবন অনেক সময়ই একটি জটিল অসাধ্য ধাঁধাররূপ ধরে অ াসে। ওঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো জীবনের এক - একটি খণ্ড অংশকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যাকে আমরা বুদ্ধি দিয়েব্যাখ্যা করতে পারি না, অঙ্কে মেলাতে পারি না। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন কম। এক - একসময় মনে হয়, তাঁর সাহিত্যের সাধনাই ছিল, কত কম বলে কত বেশি বলা যায়। তাঁর ছোটগল্প শুধু গল্প নয়, কিংবা নয় জীবনের খণ্ড কাহিনী, তাঁর ছোটো গল্প এক - এক দুর্লভ বিরল মুহূর্তে গূঢ়তর জীবনোপলব্ধির মূল্যবান উদ্ভাসন এবং মালার্মে বা ভালেরির কবিতার মতোই শিল্প তত্ত্বের এক - একটি সংজ্ঞার এক - একটি দৃষ্টান্ত। শব্দ নির্বাচন, শব্দ প্রয়োগ, শব্দ বিন্যাস এবং বাক্যের গঠন এবং অনুচ্ছেদভাগ, যতিচিহ্নের ব্যবহার এসব কিছু পিছনেই ছিল তাঁর সচেতন, সংস্কৃত ও সূক্ষ্ম মন। ওঁর সাহিত্য শিল্পতত্ত্ব - জিজ্ঞাসুদের জন্যে সোনার খনি। অবশ্য শিল্পতত্ত্বের বাইরেও তাঁর সাহিত্যের বিপুল - তাৎপর্য আছে।

প্রেমেন্দ্রের অসংখ্য গল্পের মতো 'পলাতকা' গল্পের কমল ও রমা অসুখী দম্পতি। বাসবের মনের কাছাকাছি এলেও রমার বিয়ে হয়েছিল কমলের সঙ্গে। তিন বছর বাদে রমার আকর্ষণে বাসব কমল সরকারের অজ পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে আসে। কিন্তু কমল তাকেজ ানায়, রমা চলে গেছে। শুধু কমলের কণ্ঠে শোনা যায়, 'আমরা কেউ তাকে চিনিনি; সে নিজেও নিজেকে চেনেনি --- এই হল আমাদের সকলের সমস্ত দুঃখের মূল। নিজেও সে তাই সুখী হয়নি। কাউকে সুখী করতেও পারেনি।'

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষটি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবিতায় গদ্যছন্দের তিনিই পথিকৃৎ, আবার 'য াযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল' - তে তিনিই নিয়ে আসেন নতুন পদ্যরূপ। অনিশ্চয়তায় গল্প শু করে আবার অনিশ্চয়তায় গল্প শেষ করার অভিনব ভঙ্গিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই প্রসঙ্গে 'জ্বর' গল্পটাকে আমরা স্মরণ করতে পারি। স্বামীর পদমর্যাদা, দায়িত্ব, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠায় শর্মিষ্ঠা অনেক উপরে উঠে গেছে কিন্তু তার প্রাক - বিবাহিত জীবনের প্রেমিক অনেক ধাপ নিচে নেমে এসেছে। সে দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। তার ব্রত বড়ো, কিন্তু নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন লেগে সংসার পুড়ে গেছে। আজকের দিনের আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে, তাদের একজনের দরজায় লোভে দুরাশায় ধর্ণা দিতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত জ্বরে পড়ে গ্নদের নিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফেরার পথে স্টিমারেশর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেখা হল। শর্মিষ্ঠা তাকে পেটভরে খাইয়েছে এবং অক্ষেপ করে গাঢ় গভীর স্বরে বলেছে, 'আমার কাছে কত বড় পাওনা তোমার ছিল -- তার কিই বা দিতে পারলাম! কিন্তু শর্মিষ্ঠা জানে না তার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে তার প্রেমিক চিরকুটে লিখে রেখেছিল'তোমার ক াছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।'

প্রেমেন্দ্র অনেক সময় তাঁর নিছক একটা বক্তব্য একটা গল্পের চৌহদ্দীতে ধরে রাখেন --- এমনই একটা গল্প 'লাল তারিখ'। ক্যালেণ্ডারে লাল তারিখ মানেই ছুটি আর ছুটি পেলেই দেশে ছুটে যাবে যুগল, যেখানে যূথিকা আছে, ছোট্ট খোকা আছে, পিসিমা আছেন। তার স্ব প্ন, কল্পনা, প্রেম, মাধুর্য - সবকিছু সেখানে সম্মিলিত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যুগলের যেন আর রাতদিন কাটেনা। জাগর - স্বপ্নের মায়া - মরীচিকায় সে সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েই ছিল। শেষ পর্যন্ত যুগলের জীবনে এল সেই মধুর লগ্ন। কিন্তু জ্বর, প্রবল বৃষ্টিজনিত দুর্যোগ, স্টেশন থেকে প্রচণ্ড বিভ্রাট পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছনো এবং যুথিকার জ্বর -- সবকিছু সম্মিলিত হয়ে কি যুগলের মনটাকে দমিয়ে দিল? 'না, মন দমবার কি আছে! সে জানে কালকেই না - হয় পরশু সব ঠিক হয়ে যাবে - আবার সব ভালো লাগবে যেমনটি সে ভেবেছে।'

প্রেমেন্দ্র এক সময় তাঁর বন্ধু ও সাহিত্য - সহযাত্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'উচচবিত্ত সমাজের গল্প তাদের চলা - ফেরা আচ ার - ব্যবহার স্বপ্নের বিষয়বস্তু, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কাছে অনেকটা রূপকথার কাহিনীর মতো। আমার মনে হল যাদের কথা কেউ বলে না, তাদের কথা বলব।'

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন এক শনিবারের নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায় প্রেমেন্দ্র হঠাৎ একটি পুরোনো পোস্টকার্ড জানলায় গোঁজ অবস্থায় দেখতে পেলেন।

সেদিন শনিবার মেসের কেউ কোথাও ছিল না। সপ্তাহের শেষে সবাই মেস থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ঘরের একটা জানলা খোলা ছিল। সেখান থেকে তিনি একটা পোস্ট কার্ড পেলেন। ওটা একটা জানলার কোনায় গোঁজা ছিল। তাতে লেখা ছিল, 'বউমার জ্বর এসেছে। দেখতে - দেখতে দু-মাস হয়ে গেল। ঘুষ-ঘুষে জ্বর তো কিছুতেই যাচ্ছে না।

সেই রাত্রেই প্রেমেন্দ্র লিখলেন 'শুধু কেরানী' গল্পটি। গল্পের নাম 'শুধু কেরানী', অন্য কিছু নয়। তাছাড়া, সেই একই রাত্রে প্রেমেন্দ্র অ ারও লিখলেন 'গোপনচারিনী' গল্পটি। পরদিন সকালে চুপি - চুপি তিনি ভবানীপুর পোষ্ট অফিসে গিয়ে গল্প দুটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় পা ঠিয়ে দিয়ে এলেন।

প্রেমেন্দ্র এরপর ঢাকায় চলে যান। গল্পের কথা তাঁর মনেও ছিল না। ওঁর এক আত্মীয় ওঁকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'তোমার প্রবাসী এসেছে। পড়ে পাঠিয়ে দেব।' কেন, কি বৃত্তান্ত --- কিছুই বলা নেই। অনুসন্ধিৎসু প্রেমেন্দ্র জানতে চাইলেন, ব্যাপার কী?

বন্ধু এবার জানালেন, 'ওঁরা তোমার গল্প ছেপেছেন, আর পরে একটি ছাপাবেন লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র তখন একটি পাঠাগারে গিয়ে 'প্রব াসী' পত্রিকার ও সংখ্যাটি দেখে নিলেন। 'প্রবাসী' তে 'শুধু কেরানী' প্রকাশের পর সাহিত্যিক মহলে সেইকালে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তা জানা যায় 'কল্লোল' -এর আটপৃষ্ঠা ব্যাপী সমালোচনায় এবং পরবর্তী গল্প 'গোপনচারিনী'র চারপৃষ্ঠা ব্যাপী সমালোচনায়।

প্রেমেন্দ্র এমন অনেক গল্প লিখেছেন যেগুলিতে কোনও গল্পত্ব নেই। একটি অনভূতির ক্ষণিক প্রকাশ ওইসব গল্পগুলির উপকরণ। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, 'সহস্রাধিক দুই' গল্পটি। সহস্রাধিক এক রজনীর পরেও পৃথিবীতে রহস্যময় অপরূপ রাত্রিনামে, তার পরের দিনেও যেমন জেগেছিল কলকাতার বুকের উপর। অস্তমান যৌবনের শেষ পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় আলোকিত মহানগরীতে এক ন ারী একদা সুনন্দকে কাছে টেনেছিল এবং ক্ষণিক সান্নিধ্যের পরে সেই রহস্যময়ী চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছিল।

'পরোপকার' এই পর্যায়ের একটি গল্প। মহীতোষের পরোপকার করাই ছিল স্বভাব। সেই স্বভাবের বশে সে এই গল্পের নায়কের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল অনিচ্ছাবশত। বিনিময়ে নায়ক তাকে কবিরাজি চিকিৎসার পদ্ধতি শিখিয়ে তাকে প্রায় মনোবিকারগ্রস্ত রোগীতে পরিণত

করেছে। 'পাশাপাশি'তে অবশ্য একটি গল্পের কাঠামো আছে। বিধুভূষণ ও মেজবউ নিঃসন্তান। মেজবউয়ের বুভুক্ষু হৃদয়েরস্নেহকাতরত া কিছুটা মিটত অমল ও কাননের শিশু পুত্রটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কাননের অসম্মানজনক ব্যবহার ও পিসিমার কদর্য আচরণ মেজবউয়ের মনকে বিষিয়ে দেয়। সে অন্যত্র চলে যাবার জন্য বিধুভূষণকে পীড়াপীড়ি করে কিন্তু তার স্নেহশীল মন ওদের দুর্দশার মধ্যে রেখে যেতে চায় না।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'চুরি'র মধ্যেও গল্পত্ব আছে। প্যারিমোহনবাবু আদর্শপ্রাণ দরিদ্র স্কুল শিক্ষক অথচ তাঁর অপদার্থ ছাত্র রাখাল অসৎপথে টাকা রোজগার করে ধনী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। তার কাছে চাকরির উমেদাবি করতে এসে আদর্শহীনতার ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনে ব্যথিত ও বেদনাহত প্যারিমোহনবাবু যখন বাড়ি ফিরে এসেছে তখন তাঁর মেয়ে উমার অঙ্গে পুলিনবাবুর দেওয়া শাড়ি দেখে তিনি স্তব্ধহয়ে যান, তাঁর ছেলে নেপু পাশেৰ বাড়িতে বন্ধুর সঙ্গে পড়ার বই আনবার ছুতো করে গিয়ে ঘরের দেরাজের উপর থেকে কী চুরি করার চেষ্টা করেছিল, তা জানার বা সেজন্য ওকে শাস্তি দেওয়ার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটোগল্পকে নবজাতক অবস্থা থেকে সাবালক করে তুলেছিলেন। তাঁর দ্বিজত্বের উপনয়ন ঘটেছে তাঁরই হাতে। প্রায় একশোটি গল্প নিয়ে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন মুহূর্তের মুকুরে কী করে মহাকালকে প্রতিফলিত করতে হয়, ন্যূনতম সঞ্চালনে কী করে ঘটাতে হয় গূঢ়তম অভিব্যক্তি, কী করে প্লটকে ফেলতে হয় জটিলতম পরীক্ষায়। কিন্তু এ-সবই তিনি করেছেন জীবনভাষ্যের অমোঘ টানে সাড়া দিতে গিয়ে। সৌখিন আঙ্গিক বিলাসে নয়, ছোটোগল্পের নিজস্ব টেকনিকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এমন কিছু কথা বলার অবকাশ, যা অন্য কোনও মাধ্যমে তিনি বলতে পারতেন না। সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলা যায় বাংলা ছোটোগল্পের কালের স্রষ্ট্রাও যেমন তিনি, কালান্তরের প্রধান পথিকও তেমনি তিনি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কালান্তরের সূচনা করেছিলেন ছোটোগল্পের কালটিকে প্রতিষ্ঠা করতে - করতেই১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা 'একরাত্রি' গল্পে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা ছোটোগল্পের নতুন পালায় যাঁরা প্রধানত লেখক বলে পরিগণিত হলেন তঁ াদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর যে গল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্টত প্রতীয়মান সে - গল্পটি হল রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'। এর আঙ্গিকটাই হল আঙ্গিক - নিরপেক্ষতা। এর প্রাণশক্তি প্লটনির্ভর নয়। প্রকাশ পরিমিতির মধ্যেই রয়েছে এর অভিব্যক্তির ঐর্য। সে অভিব্যক্তির বিষয় হল ব্যক্তির নিয়তি, যার কিছুটা রচিত হয় ব্যক্তির হাতে, কিছুটা রচনা করে উদাসীন বিধিবিধান।

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে প্রায় - সমসময়ে প্রবেশ করেছিলেন দু-জন আগন্তুক। জগদীশ গুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁদের বয়সে পার্থক্য আছে। সিদ্ধিতেও তারতম্য আছে কিন্তু দুজনেই ব্যক্তির ভবিতব্যের নিগূঢ় রূপটাকে দেখাতে চাইলেন। ১৩৩০ ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে যথ াক্রমে প্রেমেন্দ্র ও জগদীশ বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হন। প্রেমেন্দ্র নাগরিক সংস্কারে মার্জিত বটে কিন্তু অন্তর্গামী স্বভাবের অধিকারী। দ্বিতীয়জন যদিও কিছুটা মফস্বলীয় মন্থরতায় ম্লান তথাপি অন্তর্গূঢ়তা তাঁরও কিছু কম ছিল না।

রবীন্দ্র - পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পে এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের আরও একটি সাধর্ম্য ছিল। সে যুগটাই ছিল বিদ্রোহের ফ্যাশনের যুগ। নিশ্চয়ই রবিয়ানা একটা ফ্যাশন। কিন্তু তার বিদ্ধে বিদ্রোহটাও একটা ফ্যাশনে পর্যবসিত হয়েছিল। জগদীশ গুপ্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র সে ফ্যাশনে ফেঁসে যাননি। বিদ্রোহী তাঁরাও, কিন্তুএকজন চেয়েছিলেন বিদ্রোহকে প্রণামের মৌনে নিরপেক্ষ করে তুলতে, আর একজন চেয়েছিলেন বিদ্রোহ যেন মুখর বিজ্ঞাপনে বিহ্বল না হয়। শতাব্দীর প্রথম পাদেই আধুনিক মানুষ জীবনের জটিলতার যখন উত্তর খোঁজা শু করেছে - সেই জটিল জীবন যখন তাঁদের কাছে মনে হয়েছে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মাঝখ ানের ধরা - পড়া আজকের এরোপ্লেনের মতোই দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় অদ্যতীন জীবন - জটিলতার স ামনে নিরশ্বাস, নিপায় মানুষের।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প - শিল্পের গোড়ার কথা এটাই। সে জন্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে ভাবালুতা প্রথম থেকেই নেই। ভাবালু ব্যক্তি দরদী হতে চান। কিন্তু যে সময়ে দরদী হতে পারাটাই ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে প্রধান গৌরবের বিষয়, সে সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবন সম্বন্ধে একটা অন্য ধরনের অ্যাটিচ্যুডের পরিচয় দিলেন। একটু তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, কঠিন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকা, সহানুভূতিকে উচচকণ্ঠ হতে না দেওয়া, দৃষ্টিকে মেলে ধরবার সময়ে সমস্ত প্রকার পরকলা পরিহার, এগুলিই হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোড়ার কথার শেষ ফল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র আরেকজন গল্প লেখক, যাঁর গল্পে প্রতিটি বাক্যই জরী। প্রত্যেকটি বিশেষণ, এমন কি, ক্রিয়াপদেরও মানে আছে। একথা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধেও যেমন সত্য ছোটোগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধেও তেমনই সত্য। তাঁর এই সদাসতর্ক শিল্পকর্ম কিন্তু কোনও বাইরে থেকে চাপানো চেষ্টার ফল নয়। তিনি যেমনভাবে জীবনকে বুঝতেন, যেমনভাবে দেখেছেন তাঁরসময়ের বাস্তবতাকে, এ শিল্পপ্রয়াস তারই দান। একটা হিমশীতল নিমেষহীনতা আছে তাঁর চেয়ে থাকায়। যা সকলে দেখতে পায় তিনিতা অবশ্যই দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি পৌঁছতে চাইতেন সেখানে সময়ের হাতে জ্বলে যাবার পরেও ভস্মশেষ অস্তিত্বের বিকৃত ক্রন্দিতস্বর কম্পমান।

তাঁর শৈল্পিক সতর্কতার কারণও এখানে খুঁজতে হয়। তিনি জানতেন ছোটোগল্পে যে বিষয় তিনি বেছে নেন সে বিষয়ের মধ্যেএকটা ভাবা তিরেকের অবকাশ ছিল। গরিবী নিয়ে লেখার প্রথম প্রাবল্যের দিনগুলোতে তিনি কলম ধরেছিলেন। 'শুধু কেরাণী', 'পোনাঘট পেরিয়ে' প্রভৃতি গল্পে কি দারিদ্র্যের ছবি নেই? কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। সেখানে পরিবেশ নিয়তি বা চরিত্র নিয়তি নিয়েও তিনি তেমন মাথা ঘ

ামাননি। আধুনিককাল মানুষেরই সৃষ্টি। সেই কাল মানুষকে পুরোনো অখণ্ড শান্তি থেকে নির্বাসন দিয়েছে কোন্ হতাশ্বাস পরিণামে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে বারে বারে সেই মানুষটাকে আনতে চেয়েছেন। প্রথম গল্প থেকেই তিনি এমন এক সময়ের মানুষের ছবি আম াদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন, প্রেম সে মানুষকে কোনও বিশল্যকরণী দিতে পারে না। অনন্বয় তার নিয়তি। নিপায়ত্ব তার দণ্ড। তাই বুঝি প্রেমেন্দ্রর ছোটোগল্পগুলিতে আমরা একটা চাপা টেনশন সবসময় অনুভব করি। এই টেনশনকে ঠিক তারে বাঁধতে গিয়েই তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন একটা একান্ত নিজস্ব শিল্পশৃঙ্খলা। সে শিল্পশৃঙ্খলায় প্রতিভাত হয় যে - জীবন তার বাইরেটা স্থির, ভিতরট া অস্থির। তার আবরণ ছিঁড়ে পড়েনি কিন্তু ভিতরটা শূণ্য। কখনও - কখনও ভয় হয়। সে স্থিরতা যেন মৃতের নৈঃস্পন্দ্যের মতো। তখনই বিশেষ করে আমাদের জেনে নিতে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র সময়ের যে জটিলতার পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন তার মর্মকথা কী।

এই মর্মকথা খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্প এবার বিচার করে দেখব। 'পুন্নাম' গল্পে আমরা দেখতে পাই অসুস্থ ও কঁ াদুনে শিশুটির আবদার মেটাতে গিয়ে ললিত আর ছবি যেন বিধবস্ত হয়ে যায়। ডাক্তার যখন ওকে নিয়ে চেঞ্জে যাওয়ার কথা বলে অথব া 'একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্য এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে তখন তা হৃদয়হীন মানুষের পরিহাস বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত, ওরা ছেলেকে একদিন সত্যিই চেঞ্জে নিয়ে যায়। সেখানে টুনু নামে একটি ছেলের সঙ্গে ওদের ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত টুনু মরে গেল আর ওদের ছেলেটি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল। ললিত বিবেকের তাড়না অনুভব করে কারণ সে চুরি করে, জুয়াচুরি করে লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করে খোক াকে চেঞ্জে এনেছে যে খোকার সম্পর্কে ও ছবিকে বলেছে। 'এই খোকা ভবিষ্যতের আশা! পুত্রপৌত্রদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তার জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ বুঝেছ?

নিছক একটি আইডিয়া যেমন এই 'পুন্নাম' গল্পের বীজ, 'কুয়াশায়' গল্পের উপকরণও তেমনি একটি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উচচকিত উন্মোচন। এক নারীর আত্মহত্যার সূত্র উদঘাটন করতে গিয়ে লেখক একটি অচরিতার্থ প্রেম - কাহিনী শুনিয়েছেন। বালবিধবা সরমার জীবনে পুরোনো শ্যাওলাধরা বাড়ির জীর্ণতা, মোক্ষদা ঠাকণ ও খ্যান্তপিসির কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার এবং হেঁশেলের দৈনন্দিন একঘেয়েমি যখন সামগ্রিক ব্যর্থতা নিয়ে এসেছিল তখন ওর জীবন এল নরেন ঝোড়ো মেঘের মতে। মভূমি যেন হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পেল। যাবতীয় সংকোচের জড়তায় আবৃত থাকলেও সরমা ক্রমশ নরেনের হৃদয়ে বন্দিনী হয়ে যায়। অবশেষে পা লিয়ে যাওয়ার রাত্রে সরমা জানতে পারে নরেনের স্ত্রী - পুত্র আছে। নরেনের প্রেমের আকুতিতে তার বিদ্রোহী মন সাড়া দেয় না, সে ত ার প্রতিশ্রুতিকে দুই পায়ে অবলীলায় মাড়িয়ে চলে যায়। আত্মহনন ছাড়া তার সামনে আর কোনও বিকল্প থাকে না।

'হয়তো' গল্পেও রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। লিখিত ভাষায় লেখা এই গল্পে লেখক এমন একটি রহস্যময় পরিমণ্ডল গড়ে সেখানে মহিম ও লাবণ্যর দাম্পত্যজীবনের আলো - আঁধারির ছবি এঁকেছেন এবং মাধুরী নামের অন্য একটি রহস্যময়ী নারীর হৃদয়েরনানাবিধ কুটিল বাসনার পুঙক্ষানুপুঙক্ষ বর্ণনা করেছেন যা অনবদ্য। মহিম তীব্র বিকারে ভোগে কিন্তু সে বিকৃতমস্তিষ্ক নয়। মাধুরী অর্ন্তজ্বালায় দগ্ধ হয় কিন্তু সে লাবণ্যকে বোঝে না- এই অদ্ভুত জটিলতার গোলোক- ধাঁধার মধ্যে দিয়ে লাবণ্যকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার জীবনের পরিণতি সম্পর্কে লেখক সন্দিহান-'হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিমকে লাবণ্য কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।

যাকে আমরা প্রেম - ঘৃণা সম্পর্ক বলি, 'হয়তো' গল্পের তার প্রকাশ চূড়ান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দাম্পত্য - সম্বন্ধের জট - জটিলতা নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেকগুলি গল্প আছে। বলা যায় এই থীম্ তাঁর গল্পের বারে বারে উদ্ভাবনের অভিনবত্বে নতুন বক্তব্য সৃষ্টিকরেছে। যে দা ম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে বঙ্কিম - রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রের যুগের ধারণাটি ছিল মূলত সামাজিক - নৈতিক, ছিল বুর্জোয়া ভাবাদর্শে ধৃত নারীর স্ বতন্ত্র্য বোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন -- প্রেমেন্দ্র তাঁর গল্পে সেই প্রশ্নকে একেবারেই প্রশ্রয় দিলেন না। তাঁর প্রশ্নটি কি মনস্তাত্ত্বিক? অনেকটা তাই। কিন্তু সে মনস্তাত্ত্বিক জটের মধ্যেই রয়েছে অস্তিত্বের অমোচনীয় রহস্য। 'হয়তো' গল্পটিতে যে হত্যার ইতিবৃত্ত তা কখনও - কখনও যেন অপ্রাকৃত রহস্যলোকের হাওয়া বইয়ে দেয়। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে, গল্পে কোনও ভৌতিক পরিমণ্ডল নেই, এটা মানুষেরই গল্প। অবশ্য, এক - অ াধটি চিত্রকল্প যেন সত্যই কোনও এক অভাবনীয় পরিণামের ইঙ্গিতবহ। তার মধ্যে একটি হল ---

'লাবণ্য দেখিল। দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল।

'শকুনীর মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।'

এইসব অংশে, অথচ ভগ্ন প্রাসাদের বর্ণনা - পড়ো - পড়ো কড়িকাঠ, ধসা দেওয়াল, ভাঙা ছাদ, মাকড়সা চামচিকে ইদুঁর - সত্যই মনে করিয়ে দেয় এডগার অ্যালেন পো- এর কোনও- কোনও গল্পের বাতাবরণ -- যেমন বলেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিমের রক্তে যে সাতপুষের পাপাচারের জের, সেটাই ভূত। এর হাত থেকে মহিমের রেহাই নেই। অসুস্থ সন্দেহ নেই বংশানুক্রমে পাওয়া জীবনাচরণের ফল। প্রথম থেকে রহস্যপুরীর আবহাওয়ার রচনার ফলে গল্পটির পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু লেখকই সে পরিণাম থেকে লাবণ্যকে বাঁচিয়ে দিলেন আরও ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে তাকে ফেলে দেবার জন্য -- 'পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধবংস াবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়ে বেড়ায়।'

এখানে আরেকটি গল্পের উপকথা উল্লেখ করি। গল্পটির নাম 'শৃঙ্খল'। এটি ও দাম্পত্য বিশৃঙ্খলার গল্প। লিখিত ভাষায় লেখা এই মনস্তাত্ত্বিক গল্পের দম্পতি ভূপতি ও বিনতি সাত বছর ধরে এই বাড়িতে পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করলেও তাদের মধ্যে যে অসীম মহাদেশের ব্যবধান। ভূপতির বাবা যখন মারা যান তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। পরের সংসারে আশ্রিত হিসেবে মানুষ হয়ে একদিকে ঔদাসীন্য, এমন কি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধস্নেহ ও আদর পেয়ে ভূপতি হয়তো ঠিক স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। তার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝখানে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একথা মানলেও তার সব অদ্ভুত আচরণের অর্থ পাওয়া যায় না। জীবনের শেষ দুই বছর অনেক কষ্ট পেয়ে বিনতির বিয়ের দু-বছর বাদে ভূপতির মা মারা গিয়েছেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে বিনতির সম্পর্ক ক্রমশ আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, তার প্রকৃতি ক্রমশ রুক্ষ হয়ে ওঠে, সব কাজে শিথিলতা আসে। বিনতির প্রতি মর্মান্তিক রসিকতা বা নৃশংস আন্তরিকতা ভূপতিকে তার মনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। তবু বিনতি সন্তানসম্ভবা হয় ভাবী সন্তান সম্বন্ধে বিনতির বুক কাঁপে, সে ভূপতির ছায়া হয়ে দেখা দেবে না তো! কিন্তু মৃত সন্তান প্রসব করে বিনতি নিষ্কৃতি পায় আর ভূপতি ওর হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে যখন পরাজিত হল তখন ওদের শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী? 'তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারাছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল -- জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।'

'হয়তো' গল্পে মহিম তবু একবার বলেছিল 'ভালবাসি'। এখানে ভূপতির গলায় সেটুকুও আর শোনা গেল না। এক অন্তর্ভেদী সংলাপে গল্পটি আমাদের নিয়ে গেল জটিল গভীরে। 'মনের ঘেন্নায় তুমি তো আর নাও ফিরতে পারো, সেইটার ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।' এর উত্তরে বিনতি যা বলেছিল সেটাই তার শেষ কথা, মারাত্মক সে কথা, 'মনের ঘেন্নায় মানুষ কী করতে পারে। কউ জানে কি?' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদে আবার ঘন হয়ে উঠেছে এত অতল অন্ধকার -- 'পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়ে থাকিতেও চায়।' লক্ষণীয় 'থাকিতেও' শব্দটির ব্যঞ্জনা।

দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে তৃতীয় এক পূর্বতন সত্তার উপস্থিতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পমালায় অন্তত তিনবার দেখা গেল বিচিত্র রসপরিণামী হয়েছে -- 'স্টোভ', 'ভস্মশেষ' এবং 'জনৈক কাপুষের কাহিনী' গল্প তিনটিতে। আমরা এর আগে বলেছি, দাম্পত্য - সম্পর্ক তাঁর ছোটোগল্পের জগতে একটা বহুল - ব্যবহৃত বিষয়। বিষয়ের ঐক্য সত্ত্বেও বিষয়ার্থে ভিন্নতা সকল গল্পকে আলাদা আলাদা স্বাদে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

'স্টোভ' গল্পে দেখা যায় অধ্যাপক শশিভূষণের জীবনে একসময় মল্লিকা ছিল প্রেমিকা কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক গল্পের নায়কের মতোই শশিভূষণও মল্লিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি। বাসন্তীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পরে একদা নিতান্ত আকস্মিকভাবে মল্লিকা শশিভূষণের সংসারে দু-দণ্ডের জন্য অতিথি হয়। মল্লিকার মনে টানাপোড়েন চলে। সে ভাবে, শশিভূষণের মতো আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জড়তা ভেঙ্গে চুরমার করে নির্লজ্জের মতো তাকে সেদিন সে দখল করেনি কেন? কেন সেদিন মল্লিকা শুধু নারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায় এবং আহত অভিমানে নিজেকে দূরে সরিয়ে না রেখে জোর করে আঘাত দিয়ে শশিভূষণকে নিজের কাছে টেনে নেয়নি? পরক্ষণেই মল্লিকা ভাবে, ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি? বাসন্তীও শশিভূষণের শীতল ব্যবহারে চূড়ান্ত বিমর্ষ, স্টোভটা যেন তার হৃদয়ের প্রতীক। পুরোনো স্টোভটা ফেটে যেতে পারে কিন্তু মল্লিকার উপস্থিতিতে বাসন্তী বহুদিনের নিদ্ধ বেদনার আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটাতে চায় না।

'ভস্মশেষ' গল্পে সরমাকে অমরেশ ভালোবাসত কিন্তু সরমার বিয়ে হল জগদীশের সঙ্গে। বুকে যন্ত্রণা নিয়ে জগদীশের কাছ থেকে সরমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্প পুষে অমরেশ এল ডাক্তার হয়ে। সে এখন জগদীশ - সরমার নির্জন আবাসের প্রতিবেশী। সে সরমাকে জগদীশের সংসার থেকে উৎখাত করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যায় তবে সুকৌশলে, জোর না খাটিয়ে। অসীম ধৈর্য নিয়ে সে ভাবে, সরমার সব শিকড় আপনা থেকে আলগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিভে। কখন আর - বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধুলায়।

'সবচেয়ে মলিন ডাক্তার, সবচেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল বলেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে। কিন্তু সে শুধু অভ্যাস।

'জনৈক কাপুষের কাহিনী'র নায়ক এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাত্রে মোটর গাড়ি বিগড়ে যাওয়ায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে উত্তর বাংলায় এক চা-বাগানের বাংলোয় আশ্রয় পেয়ে যায় বিমলবাবুর, যিনি এই নায়কের একদা সহপাঠিনী - প্রেমিকার স্বামী। এই নায়ক কণার আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারেনি। নায়কের বিদায়কালে কণা প্ল্যাটফর্মে এসেছিল কি নায়কের সঙ্গে চিরকালের জন্য চলে যেতে? নায়কের কাপুষোচিক অসহায়তায় কণার আর যাওয়া হল না। সত্যিই কি কণার মনে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ এসেছিল? কণা অবশ্য নায়কের কণ অবস্থার কথা চিন্তা করে বলেছে, 'পিসিমারা কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁরা বাড়ি চেনেন ন

া। উনিও নেই, তাই নিজেই এলাম নিয়ে যেতে।' কিন্তু নায়কের মতো আমরাও ভাবি, 'সত্যিই পিসিমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সে কি স্টেশনে এসেছিল? জীবনে কোনোদিন সে - কথা জানা যাবে না।'

দাম্পত্য - সম্পর্কের প্রসঙ্গে 'হয়তো' এবং 'শৃঙ্খল' গল্পের কথা আমরা একটু আগে বলেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে এই সম্পর্ক লেখককে এত আকর্ষণ করেছে কেন। মধ্যবিত্তের সকল আবেগের চূড়া দাম্পত্য-সম্পর্ক। প্রেমেন্দ্র যে যুগে গল্পগুলি লিখেছেন সে যুগেরসর্বব্যপী শূন্যত া যক্ষারোগের মতো মধ্যবিত্তের সমস্ত আবেগের আশ্রয় ও উৎসকে শুকিয়ে দিয়েছে। তা যে কতখানি শুকিয়ে গেছে তা পর্যবেক্ষণের জন্যই লেখক যেন বেছে নেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সনাতন বাঙালি মধ্যবিত্তের সবথেকে সাধের সম্পর্কের ভগ্নস্তূপটি। এখানে আমরা এখনই যে গল্পগুলির কথা বলছি তার শুধু ভগ্নস্তূপই নয় -- সেই ভগ্নস্তূপের আলো - আঁধারিতে ছায়া ফেলেছে অতীত। স্মৃতিরবালুচর থেকে উঠে এসেছে তৃতীয় সত্তা। এ প্রসঙ্গে 'জনৈক কাপুষের কাহিনী' 'ভস্মশেষ' অপেক্ষা ব্যঞ্জনাগর্ভ, অধিকতর শিল্পগুণান্বিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ গল্পই ব্যর্থ পুষকারের কাহিনী। অবশ্যই সেই ব্যর্থ পুষকার - কল্পনার বীজ রয়েছে লেখকের সময়ের কাঠামোর মধ্যেই। তিনি যে সময়ে গল্পগুলি লিখেছেন, সে সময়ের ভূমিকাহীন মধ্যবিত্তই তাঁর কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

'জনৈক কাপুষের কাহিনী'তে নায়িকা কুমারীকালে ও পরোঢ়া অবস্থায় দু-বার অনুরোধ করেছিল, আমরা কোথাও চলে যাই। প্রথম অ াহ্বানটি ধবনিত হয়েছিল বিশ্বাসে-- তাই সেখানে ছিল উত্তম পুষের বহুবচন -- 'কিছুই আমরা করতে পারব না?' আর দ্বিতীয় অনুরে াধটি হল, 'তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না?'দু-বারই গল্পের নায়ক পিছিয়ে গেল। নায়িকার ব্যঙ্গাত্মক আবরণ নায়কের কাপুষতাকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এরকম আমরা প্রায়ই দেখেছি যে, নারী অথবা পুষ একজন কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আর একজন অ াত্মসংবরণের মন্ত্র জোগায়। কিন্তু আলোচ্য গল্পগুলিতে দু-বারই দেখা গেল, প্রস্তাবক নারী, পশ্চাদপসরণকারী পুষ।

'স্টোভ' গল্পটিতেও আমরা এই ব্যাপার দেখলাম। শশিভূষণ সম্বন্ধে মল্লিকার অনুভূতিটা এই -- 'চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। স্রোতের বিদ্ধে একটিবার খে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই।' বস্তুত ব্যর্থ পুষকারের যুগের নায়কের কাছে আর এর থেকে বেশি কী আশা করা যায়? ছাড়াছাড়ি হবার আগে মল্লিকা শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করত মিউজিয়ামে। 'মিউজিয়ামে সেটা প াথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদাণ টানে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।' শশিভূষণের আর কোনও উত্তেজনা বহনের ক্ষমত া নেই। শশিভূষণের স্ত্রী বাসন্তী জানে স্টোভটা আজ ফাটলে তার সম্মান থাকবে না। তথাপি বাসন্তীর সম্মানের দিকেতাকিয়ে স্টোভটা আজকে যেন না ফাটে। আমরা জানি স্টোভটা ফাটবে না। যে জীবন বাসন্তী, মল্লিকা বা শশিভূষণ যাপন করে, সে জীবনে বিস্ফোরণের অ ায়োজন থাকে, উদ্যোগ থাকে না -- উপাদান থাকে, কিন্তু তা অকেজো।

'ভস্মশেষ' গল্পে আমরা যে ডাক্তারকে দেখেছিলাম, সে -ও আর এক কাপুষ। বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষমতা তার ছিল না। বন্ধন ছিন্ন করার সাহসও তার নেই। অভ্যাসিকতার বিবর্ণ দড়িটা ছেঁড়া যায় কিনা তা -ও সে জানে না। এও সেই নিজ নিয়তির কাছে মার খাওয়া পুষক ারের আরেক চেহারা। নির্জিত এই পুরষকারের প্রতি নারীর কোনও সহানুভূতি থাকার কথা নয়। লেখকেরও সহানুভূতিনেই। সেটাই চরম বিস্ময়ের।

'ভবিষ্যতের ভার' মনুষ্যত্বের পতনের গল্প। শহরতলির সামান্য বাংলা স্কুলের হেড মাস্টারের চাকরি নিয়ে এই গল্পের নায়কএকদিন এসেছিল। ভেবেছিল, কত বড় সম্মানের কাজ। মাটি-কাঠ-পাথর নিয়ে কাজ নয়, মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার তার হাতে। কিন্তু একদিকে সহকর্মী শিক্ষকদের নীচতা সংকীর্ণতা ও মালিন্য, অন্যদিকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে নিরন্তর আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন গুজরান - করা এই শিক্ষককে সত্যিই ক্লান্ত করে দেয়। স্কুলের নানাবিধ নিয়মকানুনের বেড়াজালে কোনও প্রগতিশীল বা মানবিক আচরণের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে আবিষ্কার করতে হয় -- রাত্রে দুটি ছাতু খেয়ে থাকলে শরীর ভারি হালকা থাকে এবং অজীর্ণ হব ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। বউয়ের বয়স মাত্র ঊনিশ হলেও তার 'সেমিজ-টেমিজ' পরতে লজ্জা করে এবং 'আজকালের ফ্যাশান ছেড়ে খরচা বাঁচিয়ে ছেলের লিভারের দোষের চিকিৎসা চালায়। ওহভাবেই দিন চলে। জীবন চলে। শেষ পর্যন্ত অবস্থার সঙ্গে আপস করে চলতে শেখে আদর্শবাদী শিক্ষক। তাই সে ছাত্রদের বোকা বানিয়ে ক্লাসের মধ্যেই 'টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে' পরম আলস্যে নির্ভার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

লিখিত ভাষায় লেখা 'সংসার সীমান্তে'র নায়ক অঘোর একজন দাগী চোর। নায়িকা রজনী একজন পতিতা। এক দুর্যোগপূর্ণ ঝড় রাত্রে অঘোর লোকের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে রজনীর ঘরে এসে ঢুকেছিল। শেষ মুহূর্তে পয়সার লোভে ও পীড়নের ভয়ে লোকটাকে ঘরে স্থান দেওয়ার জন্য রজনীর আফসোস ছিল সাময়িক। উদগ্র প্রকৃতির অপরিচিত লোকটার সঙ্গে সারারাত এক ঘরে থাকার দুশ্চিন্তা রজনীকে বাধ্য করল না চেঁচিয়ে বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে না তুলতে। লোকটা ভোর রাত্রে চলে গেল কিন্তু পুনশ্চ রজনীর দরজায় এল।এবার রজনীর আত্রমণাত্মক প্রতিত্রিয়া ও সমবেত সকলের গণধোলাইয়ে গুরতর আহত অঘোরকে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলতে হল রজনীকে। অতঃপর অঘোর আর নড়ে না এবং রজনীর মর্মবিদারী কথাবার্তা তাকে রজনীর কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারে ন া। অবশেষে তাকে বেরোতেই হয় কিন্তু সে ফিরে আসে একগাদা টাকা নিয়ে। কিন্তু চুরিতে রজনীর ঘেন্না। বেশ্যাবৃত্তিতে অঘোরের অ

াপত্তি। উভয়ের কাছে উভয়ে শপথ করে তারা নিজেদের বৃত্তি থেকে সরে দাঁড়াবে, তারপর তারা 'দিল্লি আগ্রা' চলে যাবে। তবে বা
ড়িওয়ালীও কিস্তিদারের ঋণ থেকে রজনীকে মুক্ত করতে অঘোরকে মাত্র একবার চুরি করতে হবে। তারা বিয়ের স্বপ্ন দেখছিল, প্রস্তুতিও
শু করে দিয়েছিল টুকিটাকি কেনাকাটা করে। কিন্তু এবারে অঘোরকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। বিচারকের রায়ে তার পাঁচ বছরের জেল
হল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতের মধ্যেই বিচারককে আক্রমণ করে বসায় তার এই অদ্ভুত আচরণে কোনও গূঢ় অর্থ থাকতে পারে ভেবে
বিচারক অঘোরের শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করে দিলেন। কিন্তু বিচারক যদিও ভেবেছিলেন পরে কর্মচারীকে দিয়ে অঘোরের সম্বন্ধে ভালো
করে খোঁজখবর নেবেন কিন্তু তিনি 'নানা কাজের চাপে সে - কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বা দোষ কি। অঘোর দাস এখনও জেলে
পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনও নিশ্চয় কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরোসিনের ডিবিয়ার ম্
লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চ
য় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রের অতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।'

'অনাবশ্যক' গল্পে স্বর্ণময়ীর সাম্রাজ্য ছিল তিন ছেলে, দুই মেয়ে এবং অসহায় শিশুর মতো আত্মভোলা স্বামীকে নিয়ে। পরিণত বয়সে স্ব
ামী মারা গিয়েছেন আর ছোটো মেয়ে বেলা তার রেণুকে রেখে অল্পবয়সে চলে গেছে। রেণু স্বর্ণময়ীর কাছে সস্নেহ আশ্রয় পেয়েছে। তিনি
আবার সাংসারিক টানাপোড়েনে সবকিছু সামলে উঠে নিজের জগতের মাঝখানে কর্ত্রীত্বের আসনে বসেছেন। কিন্তু বেণু যখন তার মাম
াতো দাদার ঘরে শোবার জন্যে স্বর্ণময়ীর বিছানা ছেড়ে শান্তির আর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় ভাবনায় সমস্ত সংসার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে,
তখন স্বর্ণময়ী যেন বুঝতে পারেন সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাঁর কোনও ইচ্ছের যেন কোন ও মূল্য নেই আর।

'মল্লিকা' গল্পটির বিষয়বস্তু শ্রীপতির সঙ্গে মল্লিকার রহস্যময় সম্পর্ক নিয়ে সুবিকাশের অনুসন্ধিৎসা। অবাঙালিসুলভ চেহারাশ্রীপতির।
সে মল্লিকাকে নিয়ে থাকে মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে এক অবাঙালি - অধ্যূষিত এলাকায়। দু-জনের ব্যবধানও সুবিকাশকে ভাবায়। ক্রমশ উন্মে
াচিত হতে থাকে ওদের রহস্যময় সম্পর্কের পর্দা এবং সমান্তরালভাবে সুবিকাশ নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে মল্লিকার সঙ্গে। কিন্তু
শ্রীপতির জীবনে যখন চূড়ান্ত মূহূর্ত এল মল্লিকাকে পাবার, সেই সময় ট্রেনের কামরা থেকে মল্লিকার অন্তর্ধান সেই রহস্যময়ী নারীকে ত
ার ঘৃণ্যতম স্বরূপে উন্মোচিত করে দিল সুবিকাশের কাছে।

ভিন্নস্বাদের গল্প 'পুর্নমিলন'। হিরন্ময়ীর ব্যস্ততার আর সীমা নেই। তিনি সচ্ছল অবস্থার দিনে কী ব্রত করেছিলেন, অর্থাভাবেসে - ব্রত
এতদিনেও উদ্‌যাপিত হয়নি। সেই উপলক্ষে হিরন্ময়ীর মেয়েরা সপরিবারে বাপের বাড়িতে এসেছে। অমলা প্রকাণ্ড একটা মোটরে
একদল ছেলেপুলে এবং 'গোলগাল ছোট্টোখাট্টো ভালো মানুষ' স্বামী নিয়ে এসেছে। তার ব্যক্তিত্বের ছটায় বাড়িটা যেন কাঁপছে।কমলা
কম যায় না কিন্তু বড়দির দাপটে সে সর্বদা অপ্রসন্ন হয়েই আছে। বিমলা সর্বাপেক্ষা রূপসী মেয়ে, দত্ত পরিবারের আদরের বউ। কিন্তু
ছয়মাসের ছেলেকে সে নিজেই কোলে করে নিয়ে এসেছে এবং স্বামীর সংসারে তার পুনর্বারফিরে যাবার সম্ভাবনা কম। হিরন্ময়ীর
পরবর্তী মেয়ে আসতে পারেনি এবং সেই দুঃখে সবচেয়ে ছোটো মেয়ে খ্যান্ত মুহ্যমান। তা ছাড়া তার জীবনে কোনও সুখ নেই। অকর্মণ্যস্ব
ামীর জন্য তার দুঃখ ও গ্লানির অন্ত নেই, মনের কথা বলার মতো সঙ্গীরও অভাব।

ব্রত উদ্‌যাপনের রাত্রে তাই হিরন্ময়ীর চোখে ঘুম আসে না। 'অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার গভীর সুখ উপলব্ধি করিবার
চেষ্টা করেন। অনেক সাধ করিয়া তিনি মেয়েদের আনাইয়াছেন, একটি রাতে তাঁহার সমস্ত মেয়ে আজ একত্র হইয়াছে, তাঁহারতো
অত্যন্ত সুখী হইবার কথা, কিন্তু সত্যই কি তিনি সুখী হইয়াছেন? মেয়েদের ঠিক যেমনটি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনটি কি তাহ
ারা আর আছে? ইহারা তাঁহারই কন্যা, অথচ ঠিক যেন তেমনটি আর নাই।

'নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায়, এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম যেন তিনি সৃষ্টি সংসার ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় অতল রহস্যের সম্মুখীন
হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'পরমুহূর্তেই তাঁহার চমক ভাঙ্গে। ভাঁড়ার - ঘরে বোধ হয় তালা দেওয়া হয় নাই, কাল সকাল হইতে আবার অনেক কাজ।'

ছোটোগল্পে টেকনিকের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে গেলেন, সে টেকনিক আসলে তাঁর বিষয়বস্তুই। তাঁর টেকনিকের
কতটা পড়ে বিষয়বস্তুর এলাকায়, কতটা বিষয় বস্তুই হয় টেকনিক -- এ ভেদ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তিনি যত না পর্যবেক্ষণ করেছেন ত
ার থেকে বেশি অনুভব করেছেন। দেখেছেন যত, ভেবেছেন তার থেকে অনেক বেশি। তাঁর সেই ভাবনাটাই শিল্পরূপ। জীবনের
ভবিতব্যকে কখনও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র একই তৌলে রেখে বিচার করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগন্তুক'ও
প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুনর্মিলন' দুটি পৃথক গাল্পিক কাঠামোয় একটা কথা বলে -- সময় ঠিকভাবে ছুঁয়ে ফেললে যে যার সঙ্গে মিলিত হতেচ
ায়, তারা কেউই আর আগের জায়গায় থাকে না। দুর্জ্ঞেয় অতল রহস্যের কোনও যুক্তিসঙ্গত কাঠামো থাকে না। তাঁর গল্পের কাঠামে
াতেও বাইরের মেরামতি কম। কিন্তু তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় বন্ধন আছে। আপাতশিথিলতার মধ্যেও সেই বন্ধনের লজিকটা
কখনও ঢিলে হয়ে যায় না।

'সাগর সংগম' গল্পে তীর্থযাত্রিনী দাক্ষায়নী দুর্ভাগ্যবশত নৌকোয় যাদের সহযাত্রিনী হিসেবে পেয়েছিলেন তারা পতিতা। সেই দলের
মধ্যে ছোটো একটা সুন্দর মেয়ে ছিল। সে যে ধানি লঙ্কা। কিন্তু দাক্ষায়ণী এবং ওই একরত্তি মেয়েটি অর্থাৎ বাতাসি বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টির

জন্য মা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে যেন পুনর্জন্মের নতুন পৃথিবীতে বেঁচে উঠল। দাক্ষায়ণীর ঘৃণা আর বাতাসির অসহায়তা শেষ পর্যন্ত তাদের দুজনকে একটা নতুন বন্ধনে বেঁধে ফেলে। শেষে বাতাসি যখন তাকে চিরকালের মতো মুক্তি দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যায়তখন দাক্ষায়ণী নিজের হাতে মিথ্যে পরিচয়কে চিরকালের মতো সত্যি বলে নথিভুক্ত করে দেন।

জীবনের ঐশ্বর্যের দিক সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায় কিছুই বলেননি বললেই হয়। অল্পসংখ্যক গল্পেই তিনি মানবিকতাকে বিজয়ীর ভূমিকায় দিয়েছিলেন। এই 'সাগর সংগম' গল্পটি হল সেই অল্পসংখ্যাক গল্পগুলির একটি। এই গল্পে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। যার জোরে দাক্ষায়ণী বাতাসির কূল - মানহীনতা মুছে দিতে চায়, তা নারীত্ব নয়, মনুষ্যত্ব। এ - গল্পে যেন অন্ধকার তরলীকৃত হল। এমন গল্প যেন প্রেমেন্দ্র লিখতে চাইতেন না। যে - কবি একদা বলেছিলেন কত ঝড়, কত মেঘ আকাশের গায়ে তবু 'আকাশ কিসব মনে রাখে'? -- সে কবি কেন তাঁর ছোটোগল্পে বারে বারে এক অতরলীকৃত অন্ধকারের কথা বলেন? তিনি কি সেই অন্ধকারকেই মানুষের আদিম অন্তর্নিহিত নিয়তি বলে ভাবেন ? এ-ও এক বিস্ময়!

সাপ্তাহিক 'দেশ' প্রথম সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন 'মহানগর' গল্পটি। রতনের বিবাহিতা দিদিকে কারা যেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট রতন বুঝতে পারেনি দিদি কেন আর কোনোদিন তাদের সংসারের মাঝখানে আসবে না। সে দিদির শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে তাদের উদাসীনতায় প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। এরপরে কৈশোরে তার বাবা একবার পোনাঘাটে এলে সে কাউকে কিছু না বলে উল্টোডিঙির পতিতালয়ে গিয়ে দিদির সন্ধান পেয়েছে। দিদির নাম চপলা। চপলার কাছেও থাকতে পারেনি কারণ থাকাসম্ভব নয়। দিদির কাছ থেকে চারটে টাকা স্নেহের দান হিসেবে ও পেয়েছে এবং বড়ো হয়ে দিদিকে নিয়ে যাবে আশ্বাস দিয়ে ওখান থেকে ফিরে এসেছে। হয়তো প্রথম পর্বের গল্প বলেই এই গল্পের মধ্যে একটু দুর্বলতা আছে। গল্পের নাম 'মহানগর' হবার কোনও যৌক্তিকতা নেই কারণ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নারীর অসহায়তা পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের আবহমান ব্যাধি। তা ছাড়াপোনাঘাট পেরিয়ে বিশাল শহরের মাঝখানে পৌঁছে অচেনা উল্টোডিঙির অপরিচিত পতিতালয় থেকে চপলাকে খুঁজে বের করতে গোয়েন্দা বা পুলিশ যেখানে হিমসিম খেত, সেখানে রতনের মতো একটি আটপৌরে, সরল গ্রামের তণ ছেলের পক্ষে ওই কাজ কি করে করা সম্ভব হল?

তবে, মহানগরের ইট - কাঠ - লোহার কংক্রিট - মিনার বস্তির মধ্যে, নামহীনতার অরণ্যে গল্পে ছোট্ট নায়কের ছেড়ে দেবার আগে, ভিড়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে - পড়তে লেখকীয় সত্তা উত্তম পুষে একবার কথা বলে উঠল। 'এ সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি - মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানিক ভগ্নাংশ, তার কাহিনী সমুদ্রে দু - একটি ঢেউ। মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাদে মেটাবার নয় -- জানি।'

গল্প আরম্ভ হল আধুনিক চলচ্চিত্রের কলায়। সমস্ত দৃষ্টিকে প্রথম তিন চারটি অনুচ্ছেদে ছড়িয়ে দেওয়া হল কলকাতার আকাশ -রেখার উচ্চাবচতায়, ব্যবহৃত হল সেইসব শব্দ যাতে এই মেট্রোপলিসের উদাসীনতা, নির্মমতা ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। জটিল বিসর্পিলতা এবং উজ্জ্বল অলোক স্পষ্টতা, ক্ষত ও মিনার, নিভৃত প্রেমিক আর উত্তেজিত জনতা, সংঘর্ষ ও সংগীত- বিচিত্র যত বিপরীতের সহাবস্থানকে সে ক্যামেরা যে কতগুলো শটে আমাদের কাছে ধরে দিল। শব্দের বন্যার মাঝখানে সহসা নেমে আসে নির্জনতার ইঙ্গিত। 'ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে। 'এই অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে' বাক্যাংশটির মধ্যে পাই সমস্ত গল্পের ভাববীজ। এই বাক্যাংশে লেখক আমাদের মনকে তৈরি করে দিলেন।

যে উত্তর পুষের কথা আমরা একটু আগে বললাম, তা দেখা মিলিয়ে যাবার আগে ডুব দিল বহুবচনের মধ্যে। আমি হয়ে উঠল 'আমরা'। সংকুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়েউঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদম গাছে নিশান - দেওয়া সেই পুরোনো পোনাঘাটে। 'আমি' এবার 'আমরা' হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করি ব্যক্তি লেখক এবার নেপথ্যে সরে যাচ্ছেন। 'আমরা' বলতে যে জনপিণ্ড বোঝায় লেখক তার মাঝ থেকে এবার তুলেনেবেন তাঁর লক্ষিত চরিত্রটিকে।

রতন গ্রাম থেকে এসেছে। সে এসেছে এমন জায়গায় যেখানে কেউ কাউকে চেনে না। এই অপরিচয়ের জগতে একটা বালকখুঁজে বার করবে তার হারানো দিদিকে। প্লটের দিকে লেখকের লক্ষ প্রচলিত মতে শিথিল। যে - মহানগরে অনেকে অনেক কিছু খোঁজেআসে, এসে অনেকে হারিয়ে যায়, সে - মহানগরে রতন হারিয়ে গেল না। কেন গেল না সে বিষয়ে লেখকের কৈফিয়ৎ আর জরী হল না। কেন না গল্পের প্রারম্ভে তিনি এ মহনগরের কর্মকাণ্ডের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে একটা কথা প্রতিপন্ন হয়েছে -- এ মহানগরেরসবই সম্ভব। সুতরাং এ পৃথিবীতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব কে বলতে পারে -- মাত্র এই কথাটুকু দিয়েই তিনি রতনকে পৌঁছে দিলেন দিদির কাছে।

মেঘে - ঢাকা বেলায় খোলায় ছাওয়া মেটে বাড়ির দরজায় শুকনো মুখে রতন দাঁড়াল। যেখানে সে এসেছে, সেখানে তাকে থাকতে নেই। আবার দিদিকে তার সঙ্গে ফিরে যেতেও নেই। অভিমানে ফিরে যেতে যেতে রতন বলে, বড়ো হয়ে সে দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই। গল্প এখানেই শেষ। তারপর কেটে গেছে অনেক বছর। আজও গল্পটি শেষ করে আমাদের মনে হয় রতন কি পেরেছে দিদিকেফিরিয়ে নিয়ে যেতে? পাষাণকায়া মহানগরের সমস্ত ঔদাস্যের বিদ্ধে রতনের এই সংকল্পটির মতো প্রতিবাদ আর কি হতে পারে?

এই মানবিকতার প্রবক্তা এ নগরের সব নিষ্প্রাণতা মূঢ় হয়ে যায়।

ঘনাদার গল্প বাদ দিলে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায় দেড়শো গল্প লিখেছেন। সম্ভবত সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন ছোটোগল্প লিখে। বুদ্ধদেব বসু একদা তাঁর 'পুন্নাম' গল্পটিকে অপরিসীম প্রশংসায় অভিষিক্ত করেছেন। তিনি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো মাপের ছোটোগল্পকার বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন 'প্রগতি' পত্রিকায়। প্রেমেন্দ্র বলেছেন, অনেক গল্প লিখে তিনি খুশি হয়েছেন। পরে আবার সেগুলি তেমন ভালো লাগেনি। তবে তিনি 'শুধু কেরানী' এবং 'গোপনচারিনী' গল্প দুটির প্রতি এক অদ্ভুত মায়া বরাবরই বোধ করতেন। এক রাত্রিতে লেখা ওই গল্প দুটি 'প্রবাসী'তে পরপর দু-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল - ১৯২৩ -এর ডিসেম্বর আর ১৯২৪ - এর জানুয়ারিতে।'শুধু কেরাণী' গল্পটি 'বেনামী বন্দর' -এ সংকলিত হয়েছিল আর 'গোপনচারিনী' নামহীনভাবে ছাপা হয়েছিল 'পঞ্চশর' গল্পগ্রন্থে। সমালোচকদের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র মোপাসাঁ, চেকভ এবং পো'র সম্মিলিত রূপ হয়েও এক ভিন্ন প্রকৃতির লেখক। আপন মহিমায় আপনি প্রোজ্জ্বল। নগরজীবনের যন্ত্রণা, পতিতাদের কণ জীবনকাহিনী নিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের আসরে প্রেমেন্দ্রের আর্বিভাব। নগরজীবনের ব্যথা - বেদনা বর্ণনা তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত, একথা জানা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে, 'দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি কদর্যতা। আর চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার। উন্মাদ বিকলাঙ্গ গ্ন গলিত শব।' তবুও তিনি শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপসা নদীর উপর দিয়ে মন্থরগতিতে নৌকো যেতে দেখেছেন 'স্বপ্নের মত পাল তুলে।'

তাই, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এক অবক্ষয়িত যুগ জীবনের নোংরা গলির মধ্যে দিয়ে চলতে - চলতেও চেতনার দম বন্ধ হয়ে আসে না ....দুর্গন্ধ জঞ্জাল নাকে মুখে ছিটকে পড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দেয় না....প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বীভৎস জগতের বিচরণলগ্নেও এক সহজ মুক্তির পথের নিশানা রয়েছে যা তাঁর কবি - আত্মার দান।

কল্লোল-যুগের প্রায় সব সাহিত্যিক হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা, দূর - লোক - স্বপ্নময়তা এবং নস্টালজিয়াতে পূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিলেন। প্রেমেন্দ্র তাঁর ছোটোগল্প - উপন্যাস থেকে দূরলোক - স্বপ্নময়তা পরিহার করলেন তবে রোমান্টিকতা উপেক্ষা করলেন না। তিনি সর্বত্র রোমান্টিকতার বিজয় ঘোষণা করলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। এই রোমান্টিকতায় রিয়ালিজমের নসুর প্রবল। প্রথম - বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, কুলিমজুরদের ব্যাপক ধর্মঘট, জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং মার্কসবাদের প্রভাব, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং সংশয়, যুক্তিবাদী প্রশ্নমনস্কতা এবং ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা, অ্যাডলার আর ইয়ুংয়ের বিপরীত তত্ত্ব, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার আর গবেষণা -- কবি ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে রিয়ালিস্টিক করে তুলেছে।

তাই তাঁর রচনার রোমান্টিকতার শৌখিনবিলাস নেই, ভাবালুতা নেই, ভাবুকতা আছে। রোমান্টিকতা বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। তাঁর গল্প আর কবিতায় যুক্তিবাদিতা এবং বিজ্ঞানচিন্তার সমন্বয় ঘটেছে। বাঙালিসুলভ ভাবার্দ্রতায় তা সিক্ত নয়। তাঁর বিজ্ঞানচেতনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দার্শনিক চেতনা এবং এদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা। তাই তাঁর প্রতিটিগল্প যুক্তি, তর্ক আর বিচারের স্রোতোধারায় সিঞ্চিত। কখনও সূচনা বা সমাপ্তিতে বা গল্পের কাঠামোতে গল্পকার নিজস্ব মন্তব্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলা ছোটগল্পের নবতর রূপায়ণ করেছেন। প্রতিটি গল্পে বুদ্ধির দীপ্তি সেজন্য মুখ্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ধূলিধূসর' গল্পগ্রন্থের নামকরণ এবং প্রথম গল্প 'একটি রাত্রি' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন তাতে পূর্ণ প্রেমেন্দ্রকে চেনা যায়। তিনি লিখেছিলেন 'প্রথম গল্পটি পড়েই দেখা গেল এতো নেহাত পায়ে -হাঁটা দাগপড়া চলতি জীবনের কথা নয়, এতো সচরাচর বাইরের এলাকার। তারপরে দেখলুম অন্যান্য সব গল্পেই সচরাচরত্বের ভিতর থেকে অপ্রত্যাশিতের উঁকিমারা মুখ কোথাও বা ব্যঙ্গহাস্যে কোথাও বা দাঁত খিঁচিয়ে দেখা দিয়েছে। সেইটে তার বিশেষত্ব। ধূলির আবরণটা নয়।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রত্যেকটি চিরায়ত ছোটোগল্প বিশ্লেষণ করলে যেন একটা অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা স্মরণ করতে পারি তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটি। মফঃস্বল শহর ছাড়িয়েও যেতে হবে অজ পাড়া গাঁয়ে যেখানকার আবহাওয়া স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপসা। যেখানে শোনা যায় মশাদের ঐকতান, দেখা যায় মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে - থাকা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনও কুজ্ঝাটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়ার বিভ্রম হয়। ওখানে যেন নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে, যাদুঘরে নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে। ওই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে একজন পান - রসিক ও অপরজন নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় ব্যক্তিকে জানতে হয় ওখানকার আর একটি কাহিনী।

যামিনীর অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, মুখে আছে কণ গাম্ভীর্য। ওই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব - কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে তার মুমূর্ষু দৃষ্টিহীনা মায়ের সঙ্গে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। পান - রসিক বন্ধুর কাছেই জানা যায় যামিনীর মা তাঁর এক দূরসম্পর্কের বোনপো যামিনীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে বলে এই অজগর পুরীর ভিতর বসে সেই আশায় দিন গুনছেন।

এবার আর একজনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতির পালা। যামিনী কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভিতর থেকে মধুর এক সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে। তারপর শহরে ফিরে এসে একসময় নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া - মোছা ইতি মধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত - যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি তখন ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। 'মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও কণ, ধবংসপুরীর ছায়াটির মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনামাত্র। একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রি অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।'

গল্পে ত্রিয়ার কালের দিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন প্রয়োগ ঘটালেন 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর প্রথম অনুচ্ছেদে অনুমানবাচক ত্রিয়াপদের দুটি একটি প্রয়োগের পরই লেখক সরাসরি ভবিষ্যৎ কালজ্ঞাপক ত্রিয়াকে এই গল্পের ক্ষেত্রে জরী করে তুললেন। পাঠক গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দেখেন সে ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক কোনও সুনির্দিষ্ট পরিণামের নির্দেশক নয়। বরঞ্চ তা যেন শুধুই সম্ভাব্যতার সূচক। এমনটাই হয়, এমনটাই হতে পারে। এমনটাই হবে। এখানেও সেই ব্যর্থ বিমুখ পুষকারের গল্প। এখানেও দেখা মিলবে এক ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে পাওয়া যায় এমন এক গা - ছমছম আবহাওয়ার 'শ্রীহীন জীর্ণতা' 'নগ্ন ধবংস মূর্তি', 'সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি প্রেতপুরী' 'ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি' ---এই সবকিছুর পটভূমিতে একটি মেয়ে --- যামিনী। গম্ভীর কঠিন তার মুখ; দৃষ্টি তার সুদূর ও কণ। লেখক তার উপমান হিসেবে আহ্বান করেছেন ধবংসপুরীর ছায়াকে। সেই ছায়ার মতো মেয়েটিও বুঝি অবাস্তব --- এই ইঙ্গিতে যে ব্যঙ্গ, তার আঘাতেই যামিনীর কল্পনায় যে রোমান্টিক সৌন্দর্যাভিসার তা ভেঙ্গে গেল। 'গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও কণ' এমন মেয়েকে কোন কাল স্পর্শ করতে পারে না - তাই ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক ত্রিয়ায় তার সুদূরত্বই আরও প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিষ্ঠিত হল তার কালোত্তর ভবিতব্য।

গল্পটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যম পুষ নায়ক। লেখকের সম্ভ্রমসূচক মধ্যম পুষ 'আপনি' এ গল্পে শ্রোতা নয়, তার সম্ভাব্য ভূমিকা, অনুমেয় আচরণ এবং আন্দাজ করা চলে এমন সংলাপ, এ কথাটাই স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিচ্ছে তেলেনাপোতার ব্যর্থতার জন্য লেখক দায়ী করেছেন আপনাকে -- অর্থাৎ আমরা সকলেই সে ব্যাপারে সমান অপরাধী। অপরাধটা এই নয় যে আপনি কেন যামিনীকে মনে রাখেননি। অপরাধ বস্তুত পক্ষে কারও কিছু নেই। আপনি যা করবেন তা নিরঞ্জনও করে গিয়েছে। আমরা কে যে কখন কোন্ কাজটা করি, কোন্ কাজ ছেড়ে দিয়ে পালাই তার কোনও ব্যাখ্যাই হয় না।

তেলেনাপোতা হয়তে কোনও জায়গার নাম নয়। হয়তো লেখকের কল্পনার কোনও জগৎ যেখানে যামিনীর অবস্থান তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। 'তেলেনা' কথাটির শব্দগত অর্থ 'তুমি তা না না না' ইত্যাদি ধবন্যাত্মক শব্দে রচিত গান। সেই গানের পোতা বা ভবন অর্থাৎ সংগীতভবন যা আনন্দরূপ অমৃত দান করবে। যামিনীর ব্যর্থ যৌবন, রোগীড়িতা প্রৌঢ়া মায়ের সকণ আর্তি এবং পলাতক নিরঞ্জনের মিথ্যে আশ্বাস তেলেনাপোতাকে নতুন করে আবিষ্কার করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

যামিনীর সেই প্রেম, সেই গান যাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে লেখককেও যামিনীর মাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আসতে হয়। মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজমের মধ্যে যে 'ব্লাসফেমি' গোপন থাকে নিপুণ হাতে সে মুখোশখানাকে নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। আজ থেকে একশো বছর পরেও আমরা তেলেনাপোতা অবিষ্কারে বেরোতে হয়তো পিছপা হব না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পকে 'কল্লোল' -এর কালের গল্প মাত্র বললে ভুল হবে। তিনি কোনও বিদ্রোহের বৈভব আমাদের হাত গছিয়ে দিতে চাননি। রবীন্দ্রবিরোধী হবার যুবাবিলাসে তাঁর সায় ছিল না। এমন কি, সাহিত্যক্ষেত্রে যদিও তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ, সবচেয়ে অর্ন্তগূঢ় লেখক ছিলেন তিনি তথাপি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। নাগরিক জীবনের ধোঁয়াশাকে, তার ব্যর্থতাকে, অভিমানের পরাভবকে, পরাভবের অনিবার্যতাকে তিনি অনুভব করেছিলেন সব থেকে নিবিড়। তিনি কোনও বৃথা আশ্বাসের বর্ণাঢ্য বাহার গড়ে তোলেননি। ধূসর অন্ধকারের উপর কোনও রঙের কারিকুরি করতে যাওয়ার মতো হাস্যকর আর কিছু হয় না, তিনি তা জানতেন।

মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের অল্পদিন পরে বেরিয়েছিল 'পুর্বাশা'র রবীন্দ্রস্মৃতিসংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যা। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ছোটো প্রবন্ধ ছিল। এক কথায়, অনবদ্য। তিনিই পাঠকের চোখ ফেরালেন রবীন্দ্রনাথের গল্পে উপসংহারের দিকে 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের শেষ অনুচ্ছেদের ব্যঞ্জনা অনুভব করতে বলেছিলেন।

গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের বক্তব্যকে ওই লেখাতেই চেনা যায়। তিনি অভিজ্ঞতাকে মনের ভিয়ানে রসিয়ে নিতে জানেন। তবে, তাঁর গল্পে তারাশঙ্করের মতো তীব্র জীবনাসক্তি নেই, নেই মানিকের কৌতূহলও, তাঁর বক্র - তির্যক চোখে জীবনকে দেখা। 'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তের নোংরা রোমান্টিকতা' -র মুখোশ খুলে ধরাতেও প্রেমেন্দ্রের আগ্রহ নেই। তবু প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের দেখার রাজ্যে স্বরাট, সেখানেই তাঁর জিৎ।